সমরবিদ হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ محمد رسول الله ﷺ قائدًا للغزوات ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد عبد القادر

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

সমরবিদ হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ভূমিকা:

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে যাবতীয় যুলুম-নির্যাতন,অন্যায়-অবিচার অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির মোকাবেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর যমীনে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ দা'ঈ ছিলেন। তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও সাধনা নিবদ্ধ ছিল আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতে যেভাবে মানুষ দীনের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত হয়েছিল, তেমন চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েও অনেক লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন। পবিত্র কুরআন এ মহানুভব নেতার চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। কখনও সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে, আবার কখনও নিছক দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা এতে বাধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় তাঁকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এ সবের কোনো কিছুই নিতান্ত আক্রমনাত্মক ছিল না। এসব যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি যেসব নীতি বা বিধি অনুসরণ করেছেন সেগুলোই সমরনীতি। যার মাধ্যমে শত্রুদের থেকে ইসলাম রক্ষায় তিনি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সমরনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে, এগুলো এতো অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল যে, বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর পূর্বে এবং পরে অন্য কোনও সমরনায়কের সমরনীতিতে এসবের মিল

পাওয়া যায় না। ফলে তাঁকে নিঃসন্দেহে আমরা শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও শ্রেণী সমরনীতির প্রবর্তক বলতে পারি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো:

সমর শব্দের বিশ্লেষণ: সমর অর্থ হলো যুদ্ধ, রন, সংগ্রাম.[1] ইংরেজিতে একে বলে War, battle, Combat, Conflict, Fight.

সমর শব্দটির কিছু আরবী প্রতিশব্দ: সমর শব্দের আরবী সমার্থক শব্দ হলো, ১.আল-হারব ২.আল-সীয়ার ৩.নুফুর ৪.খুরুজ ৫.দরব আল-রিকাব ৬.আল-কুওয়াত ৭.রিবাত আল-খায়িল ৮.রাওউন ৯. ওয়াগা ১০. হায়্যাজ ১১. গাযওয়াহ ১২. সারিয়্যাহ ১৩. কিতাল ১৪. জিহাদ।

1. আল-হারব(الحرب) :সমরের একটি আরবী সমার্থক শব্দ। এর অর্থ যুদ্ধ। শব্দটি ধ্বংস, অনিষ্ট, হত্যা, ও কৃতঘ্নতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হারব এর প্রচলিত অর্থে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝায়। অবশ্য এ সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সামনাসামনি না হয়েও (আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে) শত্রুর মুকাবিলা। আল-কুরআনে হারব শব্দটি ছ'টি জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

2. আস-সীয়ার-:(السير) সীয়ার হচ্ছে সীরাহ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে পন্থা, জীবন চরিত ও পদ্ধতি। আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন,

---

[1] এস,কে,আহমদ,জয় নব অভিধান, ঢাকা: জয় বুকস ইন্টা:১৪০৬ পৃ.৩১১।

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবন চরিত্র বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা আসার জন্য সীরাহকেও জিহাদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ (আইন বিশারদ) সীরাহকে মাগাযী (যুদ্ধ) হিসেবে ধরেছেন। অবশ্য কেউ কেউ সীয়ারকে মাগাযী বলেন নি, তবে মাগাযী (যুদ্ধ) ও সন্ধির বিধানগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত্র আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

3. নুফুর—(نفور) : শব্দটি نفر-থেকে নির্গত। এর অর্থ অভিযান। ঘৃণা, বিমুখতা, অনীহা, পালানো ,বিক্ষিপ্ত বা পৃথক পৃথক দল, হিজরত, সর্বোপরি এর এক অর্থ অভিযানে বের হওয়া। কালক্রমে এখন শব্দটি যুদ্ধ বা সশস্ত্র অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

4. খুরুজ:(خروج) এর সাধারণ অর্থ বের হওয়া। তবে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়াকেও বুঝায়।

5. দরব আল- রিকাব-:(ضرب الرقاب) এর অর্থ আঘাত। আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়ের অর্থ গর্দানের ওপর আঘাত করা।

6. আল- কুওয়াত :(القوة)এর অর্থ শক্তি। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল- কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

7. রিবাত আল-খায়িল-(رباط الخيل) : এর অর্থ সীমান্ত রক্ষার জন্য অশ্বারোহী সেনার চৌকি বা ছাউনির ব্যবস্থাকরণ। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

8. রাওউন–(روع) :এর অর্থ ভয় বা আতংক। প্রাক ইসলামী যুগ থেকে এ শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

9. ওয়াগা– :(وغي) এর অর্থ শোরগোল গোলযোগ। এ শব্দটি দিয়েও যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে।

10. হায়্যাজ–(هياج) :এর অর্থ ক্রোধ বা আক্রোশ। এ শব্দটিও যুদ্ধ অর্থে সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

11. গাযওয়াহ-(غزوة) : এর অর্থ যুদ্ধ যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

12. সারিয়্যাহ (سرية) :এর অর্থ যুদ্ধ (যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল না)।

13. কিতাল-(قتال) :কিতাল শব্দটির অর্থ মারা, হত্যা, যুদ্ধ, প্রতিশোধ, অভিশাপ, সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামকে কিতাল বলে। আল-কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকারকারীর (কাফির) বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝানোর (যুদ্ধের অনুমতি বা নির্দেশের) ক্ষেত্রে

সাধারণত: قتال - শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত এ আয়াতে: ‘তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে, যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম’ ব্যবহৃত হয়েছে। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে জবাবে নাযিলকৃত আয়াতেও কিতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিমদের দু‘বিরোধী দলের সংগ্রামের পর মীমাংসার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশিত আয়াতেও কিতাল শব্দটি প্রয়োগ হতে দেখা গেছে। قتال শব্দটির মূল অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। আল-কুরআনে সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে جهاد শব্দটি একবারও ব্যবহার করা হয়নি। মূলত: এখানেই جهاد এবং قتال এর মধ্যে পার্থক্য। আর জিহাদ হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, আর কিতাল হচ্ছে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক শব্দ। জিহাদ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরযে আইন, আর কিতাল যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ফরয[2]। কিন্তু যুদ্ধে অক্ষম মুসলিমদের জন্য তা ফরযে কিফায়া।

[2] তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শর্ত হচ্ছে:

১- সুনির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে সে যুদ্ধ হতে হবে। সুতরাং যেখানে কোনো জনপ্রতিনিধিত্যপূর্ণ সরকার আছে, সেখানে সে সরকারের অনুমতি ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যাবে না।

14. জিহাদ-(جهاد): শব্দটি جهد শব্দ থেকে নির্গত। ج-(জিম) বর্ণের ওপর পেশ হলে এর অর্থশক্তি ও সামর্থ্য, কঠিন, অতিরিক্ত, পরিশ্রম। আর জিমের ওপর ফাতাহ হলে এর অর্থ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা, প্রচেষ্টা, লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো, পরীক্ষা করা, আগ্রহ প্রকাশ করা, ক্ষীণ বা দুর্বল করা, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করা, এবং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। যুদ্ধে দুশমন প্রতিরোধে সব শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা। তাই জিহাদ হচ্ছে শত্রু দমনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ। ইসলামী পরিভাষায়- জিহাদ হচ্ছে কাফির-আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শ্রম ও প্রচেষ্টা চালানো। অথবা কাফেরদের হাত থেকে আল্লাহর দ্বীনকে হিফাযত করার জন্য পরিচালিত যাবতীয় প্রচেষ্টাই জিহাদ। যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিহাদ হলো সত্যধর্ম গ্রহণের আহবান, প্রত্যাখ্যাত হলে যুদ্ধ করা।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জিহাদ।

২- অবশ্যই তা যুদ্ধরত কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে হতে হবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কোনো সশস্ত্র যুদ্ধ ইসলাম অনুমোদন করে নি। অনুরূপভাবে মুসলিমদেশে নিরাপত্তাসহ বসবাসকারী কোনো অমুসলিমের বিরুদ্ধেও এ ধরণের যুদ্ধ করা যাবে না। [সম্পাদক]

ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কালেমা প্রচারের লক্ষ্যে (চুক্তিবদ্ধ জাতি ছাড়া) কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ।

গরীব আল হাদীছ ওয়া আল আছার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জিহাদ হচ্ছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুপাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। এ প্রস্তুতি কথা ও কাজ উভয় দ্বারা হতে পারে।

অতএব, সমরবিদ বলতে বুঝায় যুদ্ধ, রন সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পরিভাষায়: জার্মানির প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ক্লজ উইজ বলেন: সমরনীতি, প্রতিরক্ষানীতি ও কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই হলেন সমরবিদ। আর সমরনীতি ও কৌশল বলতে আমরা বুঝি কোন দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দুশমনের সাথে লড়াই করা[3]।

সুতরাং সমরনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ যে কোন সমরনায়কই সমরবিদ। সাধারণত কোন যুদ্ধে সফল নেতৃত্বদানকারী ও সফলতা অর্জনকারীকে আমরা সমরবিদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

যুদ্ধ ও সমরনীতিঃ যুদ্ধ ও সমরনীতি এক নয়। সমরনীতি সাধারণত রাষ্ট্রনায়ক কিংবা রাজনীতিবিদগণ প্রণয়ন করে থাকেন। এক সময় হয়ত যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, যুদ্ধ না করলে দেশ ও জাতি রক্ষা হয় না। আবার

---

[3] মেজর জেনারেল আকবর খান, মহানবীর প্রতিরক্ষা কৌশল,পৃ.২৯;হাদীসে দেফা,অনুবাদক: আবু সাইদ ওমর আলী,ঢাকা:ই,ফা,বা,প্রথম প্রকাশ-১৯৮৪,

কখনো শত্রু দেশ প্রান্তে উপনীত, কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে তখন সন্ধি করাই শ্রেয় বিবেচিত হয়। কখনও বা যুদ্ধের প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু তখন যুদ্ধ করা ক্ষতিকর কিংবা বোকামি হয়। আবার শত্রু হয়ত বহু দুরে, কিন্তু কখনো অগ্রবর্তী হয়ে তাদের পথ রোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলকথা দেশ ও জাতির অবস্থা সামনে রেখে কখনো যুদ্ধ করা এবং কখনো না করা, কখনো কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং কখনো চুক্তি না করা। কখনো সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা, কখনো কম করা, কখনো দেশ রক্ষা খাতে কত ব্যয় করা। সৈন্যদের জন্য কখন কি অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করা এবং যুদ্ধ বাধলে সেসব রসদ কিভাবে ব্যবহার করা। কোথায় ঘাঁটি তৈরি করা, কখন কি সংবাদ প্রচার করা এবং কি সংবাদ গোপন রাখা উচিত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সমরনীতির অন্তর্ভুক্ত। আর যুদ্ধ বলতে বুঝায় ঐসকল নীতির অনুসরণে শত্রুর মুকাবিলা করা।

যুদ্ধের সাফল্যের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় কোন সুদক্ষ সমরবিদের, যার দূরদর্শিতা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশের উপর সবকিছু নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন হয় কোন যুদ্ধনিপুণ সেনাপতির, যার আদেশে সৈন্যবাহিনী পরিচালিত হবে। তৃতীয়ত প্রয়োজন হয় বীর সাহসী, ধৈর্যশীল ও অনুগত যোদ্ধা-বাহিনীর, যারা যুদ্ধক্ষেত্রেও ধৈর্য ও আনুগত্যেও চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সমরনীতিবিদ এবং শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তেমনিভাবে মুজাহিদ বাহিনীকেও

তিনি এমন ভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, এদের সমকক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ নেই।

যুদ্ধ কেন এবং কোন ধরনের?

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরবের কাফির মুশরিকদের দীনের পথে আহবান জানালেন তখন তারা বিরোধিতা করতে লাগল। তার দ্বীন প্রচারেও তারা ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাদের আশংকা হলো যে, দীর্ঘদিন যাবত তারা যেভাবে মানুষের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তার অবসান হয়ে নতুন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর দ্বীনকে নিভিয়ে দিতে সকল কূটকৌশল গ্রহণ করে। এসবের মোকাবিলায় নির্দোষ নিরপরাধ ও নির্যাতিত মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ﴾ [الحج: ٣٩]

“(কাফিরগন) যাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু তারা মাজলুম, আর আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য দানে সক্ষম।”(সূরা হজ্জ:৩৯)

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾ [البقرة: ١٩٠]

“যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়। আল্লাহর পথে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদেরকে অগ্রে আক্রমণ করে সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।”(সরা আল বাকারাহ:১৯) কুরআনের অন্যত্রে এসেছে

﴿ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ ﴾ [الحج: ٤٠]

“যারা অন্যায়ভাবে নিজ দেশ হতে বহিষ্কৃত হয়েছে, অন্য কোনও অপরাধে নয়। বরং এতটুকু বলার জন্য যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষদ্বারা পরাভূত না করতেন তবে সন্ন্যাসীদের তপস্যা-কুটির, ইসায়ীদের ভজনালয়, ইয়াহুদীদের পূজা-গৃহ এবং মুসলিমদের মসজিদ ইত্যাদি যেখানে অসংখ্যবার আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে, নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতো। আর যে ব্যক্তি তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে অবশ্য আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।” (সূরা হজ্জ:৪০)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমাগুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, নির্যাতিত নিপীড়িত দেশ থেকে বিনা অপরাধে বহিষ্কৃত মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনও অবস্থাতেই কোনও প্রকার সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার বেশিরভাগই ছিল প্রতিরক্ষামূলক। আবার কোথাও কোথাও তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াতদানে বাধা হওয়ার কারণে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তন্মধ্যে ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ ছিল সরাসরি প্রতিরক্ষামূলক। আর বদর, তাবুক ও মক্কা বিজয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলেও একথাই প্রতিভাত হয় যে, এসব যুদ্ধের মূলে ছিল কাফেরদের চরম বাড়াবাড়ি, অগ্রে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ, দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি প্রভৃতি। অতএব যেসব প্রাচ্যবিদ এসব যুদ্ধকে শুধু আক্রমনাত্মক বলেন তা অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন ৫৩ বছর তখন তিনি মদিনায় হিজরত করেন, তারপর থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। কিন্তু নবুয়ত লাভ করেছিলেন ৪০ বছর বয়সে। অবশিষ্ট তের বছর অনেক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন, হাবশায় হিজরত করেছেন। তার প্রিয় সাহাবীগণের উপর অনেক নির্যাতন চালানো হয়েছে। তথাপিও দীনের স্বার্থে ধৈর্য ধারণ করেছেন। যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধুই আক্রমনাত্মক হতো তাহলে ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল কেন?

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোনটিতে স্বয়ং নিজে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, যাকে ঐতিহাসিকগণ গাযওয়া বলে। আবার কোন কোন অভিযানে নিজে অংশ গ্রহণ না করে, বিশেষ সাহাবার সেনাপতিত্বে বাহিনী প্রেরণ করেছেন, এগুলোকে সারিয়া বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর জীবনে মোট ২৯ টি গাযওয়াহ এবং ৬৩ টি সারিয়্যাহ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর সশরীরে অংশগ্রহণকৃত গাযওয়ার সংখ্যা নয়টি যথা: বদর, ওহুদ, আল মারায়সী, খন্দক, কুরায়জা, খায়বর, ফাতহ্ মাক্কাহ্, হুনাইন, আত-তায়েফ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে মোট সাতাশটি জিহাদে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সাদ উক্ত মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের মতে, ২৪ টি এবং জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর মতে ২১ টি এবং যায়েদ ইবনে আরকামের মতে ১৯ টি, মূসা ইবনে ওকবার মতে ৮ টি ।

মূলত سرية غزوة جيش بعث এর সংজ্ঞা নিরূপণে পার্থক্য থাকার কারণে উক্ত মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর জীবনের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা:

যদি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সমরবিদ হিসেবে কত উচ্চ আসনের ছিলেন। যোদ্ধা হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন? সাহাবায়ে কিরামকে তিনি কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তার যুদ্ধ উপকরণ কেমন ছিল?

যুদ্ধের ময়দানে তিনি কেমন কৌশল অবলম্বন করেন? নিম্নের আলোচনা থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সহজেই পেয়ে যাব।

প্রতিরক্ষা খাতের স্থান নির্বাচন:

হিজরতের পূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি**।** তাই তাঁর সমর জীবনের ইতিহাস হিজরত সংঘটিত হওয়ার পরই শুরু হয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাই যে তিনি হিজরতের পরই মদীনাতে মুসলিম, ইয়াহুদী গোত্রগুলো নিয়ে যে রাষ্ট্র গঠন করেন তাতে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা খাতকে। শহরের অভ্যন্তরে থেকে তারা শত্রুর মোকাবেলা করবে না কি শহরের বাইরে গিয়ে অবস্থান নিবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তার উপর ন্যস্ত ছিল।

সামরিক চুক্তিস্থাপন:

সামরিক চুক্তি, এটা রাসূলের জীবনের সামরিক তৎপরতার অন্যতম কাজ। যা তার সামরিক জীবনকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছে। মদিনায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পার্শ্ববতী গোত্রগুলোর সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেন। মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ ও তাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। শত্রুপক্ষকে শহর রাষ্ট্র মদীনার মিত্রদের আক্রমণ করেই তৃপ্ত থাকতে হত, বড় জোর এটা হতে পারত মদীনা আক্রমণের ওয়ার্নিংস্বরূপ। ফলে মদিনার চতুর্দিকে এক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি হল।

গোয়েন্দা বাহিনী গঠন:

গোয়েন্দা বাহিনী গঠন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমরজীবনে বুদ্ধি- বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে। বদর যুদ্ধের ঠিক পূর্বে কোরাইশ- কাফেলার উপার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা বাণিজ্যে বের হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে ছিলেন সিরিয়ায় তাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য। তৎকালীন একমাত্র দ্রুত বাহন উটের মাধ্যমে। গোয়েন্দা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই রাসূল বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিলেন এবং তিনি অভিযানেও বেরিয়ে পড়েছিলেন। তথ্য যাতে শত্রু শিবিরে না পৌঁছে সে জন্য যথাসাধ্য সতর্কতাও অবলম্বন করেছিলেন.[4]।

নিরাপদ স্থান নির্বাচন ও অনায়াসে আত্মগোপনের সুযোগ ও কৌশল:

অভিযানে বের হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উত্তরে না গিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন দক্ষিণে মক্কার দিকে। নিরাপদ একটি অবস্থানে থেকে শত্রুর পথরোধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি বদরকে নির্বাচন করলেন। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে সংকীর্ণ উপত্যকায় এ অবস্থান মুসলিম বাহিনী অনায়াসে পাহাড়ের কোলে আত্মগোপন করতে পারত। আবার সংকীর্ণ উপত্যকায় শত্রু সেনা উপর অতর্কিত হামলা চালানো ছিল সহজ। শত্রু বাহিনীর সন্ধানে মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালায়। নবীজী নিজেও দুজন সাহাবীসহ তথ্যের সন্ধানে বেরিয়ে

---

[4] আল্লামা আযাদ সুবহানী, বিপ্লবী নবী, মাওলানা মুজিবুর রহমান, ঢাকা: ই, ফা, বা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫।

পড়েন। সঙ্গী সাথীগনের সঙ্গে আলোচনান্তে তিনি মুসলিম বাহিনীর তাবু স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করেন।

পানির উৎস নিয়ন্ত্রণ:

এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় চলে গিয়েছে এবং মক্কার মুশরিকরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গী সাথীদের সাথে আলোচনান্তে উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির একমাত্র উৎস নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ বদরের যে স্থানে কুয়োটি অবস্থিত সে স্থানটিতে শিবির স্থাপন করেন। যা ছিল বদরের পানির একমাত্র উৎস।

জলাধার নির্মাণ ও পানির কুয়োর প্রহরী নিযুক্ত:

সাহাবীগনের পরামর্শক্রমে কুয়োর পাশে একটা জলধার খনন করেন এবং জরুরী অবস্থার কথা বিবেচনায় এনে জলধারটি পানি দ্বারা পূর্ণ করেন। শত্রু সেনারা যাতে কুয়োর পাশে আসতে না পারে সেজন্য একজন প্রহরী মোতায়েন করেন। সতর্কতামূলক এসব ব্যবস্থা সামরিক বিবেচনায় খুবই ফলপ্রসূ বলে ইতোমধ্যে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত মুসলিম সেনারা দুজন লোককে গ্রেফতার করে, তারা কুয়োর দিকে আসছিল পানি নিতে।

সৈন্যদের দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের উপর অনুমান করে শত্রু সংখ্যা নির্ধারণ:

এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামরিক জীবনের কূটনীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রেফতারকৃত সেনাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। "তোমরা কে? "আমরা মক্কী বাহিনীর লোক" তোমরা কতজন? "আমরা জানি না।" "তোমাদের লোকের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবাই হয়? "একদিন নয়টি জবাই হলেও পরের দিন ১০ টি। একটি উটের গোশত ১০০ জনের আহার চলে। এ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করলেন যে, তাদের সংখ্যা হবে ৯০০ থেকে ১০০০ সৈন্য। বাস্তবে তারা ছিল ৯৫০ জন.[5]।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধ উপকরণ:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালে যুদ্ধের জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন তা হল অশ্ব, বর্ম, উট, তলোয়ার, তীর। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। অশ্ব ছিল মাত্র ২ টি, উট ছিল ৭০ টি, বর্ম ছিল ১২ টি, সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করে।

সারারাত ইবাদত:

---

[5] ড.মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, জিহাদের ময়দানে রাসূল মুহাম্মদ(সা) অনু: মুহাম্মদ লুতফুল হক , ১ম প্রকাশ, ঢাকা:ই,ফা,বা ১৯৯১।

বদর যুদ্ধে রাতভর সমস্ত সৈন্য বিশ্রাম নিলো কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত ইবাদতে মশগুল ছিলেন।

সৈন্যদের শ্রেণীবিন্যাস ও অধিনায়ক নির্বাচন:

১৭ রমজান ফজরের পর তিনি মুসলিম বাহিনীর সামনে জিহাদ সম্পর্কে এক উদ্দীপক ভাষণ দেন। অত:পর যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করলেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে অধিনায়ক নির্বাচন করলেন।

যুদ্ধের ময়দান পর্যবেক্ষণ ও সামরিক দপ্তর স্থাপন:

বাহিনীর নিরাপত্তা ও ঝুঁকি থেকে মুক্তির জন্য সম্ভাব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলেন। পাহাড়ের চূড়ায় ছোট ঘর তৈরি করা হলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যাতে গোটা যুদ্ধ ময়দান স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং অধিনায়কগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলো। বস্তুত পক্ষে এ কুড়ো ঘরটি ছিল মুসলিম বাহিনীর প্রধান সামরিক দপ্তর। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব তিনি এখান থেকেই পালন করেন। যেটি ছিল শত্রু সেনাদের দৃষ্টির বাইরে এবং মক্কী বাহিনীর তীরন্দাজদের তীরও এ ঘরে আঘাত হানতে পারতো না। দ্রুতগামী দু’টি মাদী উটকে সদর দপ্তরের পাশে বেধে রাখা হলো। এটা করা হলো দুর্যোগ মুহুর্তে ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে।

মুক্তিপণধার্য:

মুসলিম বাহিনী আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল এবং সংখ্যা স্বল্পতা নিয়েও বিশাল বাহিনীকে পরাভূত করল। শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হলো বিপুল পরিমাণে, যুদ্ধক্ষেত্রে ৭০জন নিহত হলো, আহত হলো অসংখ্যজন। শত্রু সেনাদের দুর্বল করণের জন্য মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হল। যাতে মুসলিমদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত হয়।

তলোয়ার না ধরার প্রতিশ্রুতি:

যাদের মুক্তিপণের ক্ষমতা নাই, লেখাপড়াও জানা নেই তারা আর কখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরবে না এ শর্তে মুক্ত করে দেয়া হল।

মুসলিম বন্দীকে মুশরিক বন্দীর বিনিময়ে মুক্তকরণ:

পুতুল তথা মুর্তিপূজারী বন্দীর বিনিময়ে মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়ে আনার ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উপযুক্ত স্থান নির্বাচন:

ওহুদ যুদ্ধে সাতশ'র চেয়ে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী তিন হাজার সৈন্যের বিশাল মুশরিক বাহিনীর মুখোমুখি হল। ওহুদ পাহাড়টি ছিল দু'টি বৃত্ত বিশিষ্ট একটি ধনুকের মত। অভ্যন্তর ভাগের বৃত্তে প্রবেশের পথটি খুবই সংকীর্ণ। মুসলিম বাহিনী এখানেই শিবির স্থাপন করে। সামরিক দৃষ্টিতে এ স্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ পথ দিয়েই শত্রুসেনাদের পক্ষে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল এবং শত্রুসেনার

আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ স্থানটি নিয়ন্ত্রণে রাখা ছিল জরুরী। এ স্থানটি প্রহরার জন্য ৫০ জন তীরন্দাজকে নিয়োগ করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি তোমরা প্রত্যক্ষ কর যে শকুনরা মুসলিমদের মৃতদেহ ক্ষত বিক্ষত করছে তবু তোমরা স্থানচ্যুত হবে না।

পরবর্তীতে যখন ঐ টিলাটি মুসলিম প্রহরা শূন্য হয় তখনই মুশরিক বাহিনী তাদের আক্রমণ দ্বারা মুসলিমদের প্রতিহত করে এবং মুসলিমদের প্রচুর ক্ষতি সাধন হয়। এ যুদ্ধে বর্মধারী সৈন্য ছিল ১০০ জন।

যুদ্ধ শেষে কাফিরদের গতিবিধির লক্ষ্য:

যুদ্ধ শেষে কাফিরদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য তিনি কয়েকজন সৈন্য পাঠালেন। বলে দিলেন যদি তারা উটের পিঠে সওয়ার হয় তাহলে বুঝতে হবে ওরা ফিরে যাবে মক্কায় দীর্ঘ সফরে। আর যদি ঘোড়া ব্যবহার করে তাহলে ওদের গন্তব্যস্থল হবে মদীনা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামরিক ধী শক্তি থেকে অনুধাবন করতে পারেন যে, পথ চলতে চলতে শত্রু সেনারা আবার মদীনার উপর আক্রমণ করার ও লুটতরাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাই তিনি আবু সুফিয়ানকে পশ্চাদধাবন কবার জন্য আবার অভিযানে বের হন। ইত্যাবসরে আবু সুফিয়ান উপলব্ধি করতে পারে যে, বিজয় অর্জনের জন্য সবটুকু সুযোগের

ব্যবস্থায় না করে সে ভুল করে ফেলেছে[6]। **কিন্তু পরবর্তীতে সে মুসলিমদের প্রস্তুতির কথা শুনতে পেরে চলে যেতে বাধ্য হয়।**

পরিখা খনন:

খন্দকের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় কি ত্রুটি আছে এবং কোথায় পরিখা খনন করতে হবে তা নিরূপণ করেন। পরিখাটি এতখানি চওড়া করেন যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়াও লাফ দিয়ে তা অতিক্রম করতে পারত না। আবার ৩/৪ ফুট গভীর থাকায় কেউ পরিখায় পড়ে গেলেও নিজ প্রচেষ্টায় উঠে আসাও সম্ভব ছিল না। মক্কাবাসীরা এ ধরনের পরিখা যুদ্ধে মোটেও পারদর্শী ছিল না। তাই তারা পরিখা অতিক্রম করতে পারল না।

বিনা যুদ্ধে দ্বি-মুখো আক্রমণ প্রতিহত:

পরবর্তীতে যখন মুশরিকদের দ্বারা অবরোধ চলছিল, তখন তারা বিকল্প অন্য একটি পরিকল্পনা করছিল। তারা দেখল দীর্ঘ মাস ব্যাপী যুদ্ধ করার পরও বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে খায়বরের নেতার অবস্থা অনুধাবন করার জন্য অতি সংগোপনে মদীনা সফর করেন। ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জা তখনো মদীনায় বসবাস করছিল এবং মুসলিমরাও ছিল তাদের প্রতি আস্থাশীল । খায়বরের বনু নযির গোত্রের ইহুদী নেতা মদীনার ইয়াহুদী গোত্র

---

[6] লে:কর্নেল এম কোরেশী,গৌরবদীপ্ত জিহাদ,অনু: মুহাম্মদ লুতফুল হক, ১ম প্রকাশ,ঢাকা:ই,ফা,বা, ১৯৮৯।

বনু কুরায়জার নেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। সে বনূ কুরায়জার নেতাকে এ মর্মে রাজী করতে সমর্থ হল মিত্রবাহিনী যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে, বনু কুরায়জা তখন পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলিমদের আক্রমণ করবে। দু'দিক থেকে চাপে পড়ে মুসলিম বাহিনী নাস্তানাবুদ হবে এবং তাদের পরাজয় ঘটবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রকে জানতে পারেন। তিনি তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে মিত্র বাহিনীর এ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালান। এ কাজের জন্য তিনি এমন একজন লোককে নির্বাচন করলেন যাকে সকলেই পৌত্তলিক হিসেবে জানত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন নওমুসলিম। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর রাজনৈতিক মিশনের দায়িত্ব দিয়ে প্রথমে বনু কুরায়জায় পাঠান। তিনি বনু কুরায়জাকে বললেন, মিত্র বাহিনী যে কখনো তাদের পরিত্যাগ করবে না, এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কারণ যুদ্ধ শেষে এককভাবে তাদেরকে মদিনায় থাকতে হবে এবং মুসলিমদের প্রতিরোধ করার মত সমর্থ তাদের নেই। তিনি তাদের আরও পরামর্শ দিলেন যে, তাদের উচিত হবে মুশরিকদের নিকট হতে কয়েকজন ব্যক্তিকে জামিন হিসেবে রাখা। এর ফলে শেষ মুহুর্তেও যে মুশরিকরা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এরপর তিনি গেলেন মিত্র শিবিরে কোরাইশ ক্যাম্পে, সেখানে তিনি পরিচিত ছিলেন একজন পৌত্তলিক হিসেবে। তিনি তাদেরকে বনু কুরায়জা ও মুসলিমদের মধ্যকার যোগাযোগের কথা জানালেন, গোপন তথ্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে তিনি বললেন ইয়াহুদীরা কয়েকজন কোরাইশ নেতাকে

নিজেদের কাছে নিতে চায় এবং তারা তাদেরকে সোপর্দ করবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে। পরবর্তীতে কোরাইশ নেতারা বনূ কুরায়জার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসে এবং বনু কোরায়জা দুটো দাবী উত্থাপন করে। প্রথমত: কোরাইশদের কয়েকজন লোককে তাদের নিকটে জামিন হিসেবে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, শনিবার যুদ্ধ করা যাবে না। ফলশ্রুতিতে কোরাইশ এবং বনু কুরায়জার মধ্যকার মৈত্রী সম্পর্কের এখানেই সমাপ্তি ঘটে এবং শাওয়াল মাসের শেষে দিনটিতে মদীনার উত্তর দক্ষিণ দিক হতে একযোগে যে আক্রমণ হওয়ার কথা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমরবিদ্যায় গভীর মেধা থাকার কারণে উক্ত আক্রমণকে বিনা যুদ্ধে প্রতিহত করা হল।

মক্কা-অভিযান:

এখন আমরা লক্ষ্য করব মক্কা-অভিযানের দিকে। সেই অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কঠোর সমরনীতি অনুসরণ করেন নিম্নে সেগুলোকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

- এ অভিযানের প্রথমই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রবেশের সবগুলো পথ বন্ধ করে দিলেন।

- প্রত্যেক প্রবেশের পথে সেনা মোতায়েন করলেন।

- গৃহীত প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন তথ্য যাতে পাচার হতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা নিলেন।

- সঙ্গী সাথীগণকে শুধু জানিয়ে দিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযান অত্যন্ত নিকটে। তিনি তাদেরকে প্রস্তুতিও নিতে বললেন।

-অভিযান সম্পর্কে আর কোন ব্যাখ্যা দিলেন না।

-অভিযানের লক্ষ্য, সূত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকটও ছিল অজানা। এ অভিযান সম্পর্কে তিনি যে কি গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন এ ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর নিকট এ অভিযান সম্পর্কে জানতে চান। কোথায় অভিযানে যাবে এবং কখন যাবে- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও সে সম্পর্কে কিছু জানতেন না।

রক্তপাতহীন বিজয়:

অতঃপর রাসূল এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কেবলমাত্র একজন সমরবিশারদের পক্ষেই বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা সম্ভব।

মৈত্রী গোত্রগুলোকে বললেন এবার অভিযানে যাবার সময় তাদের মদীনায় আসা অনাবশ্যক। বরং তারা প্রস্তুত থাকবে। যখন মুসলিম বাহিনী তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে তখনই তারা মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিবে। কিন্তু কোথায় তারা অভিযানে যাবেন সে বিষয়টি তাদের কাছে অজানা রয়ে গেল।

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সূত্রে বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দক্ষিণে মক্কার দিকে না গিয়ে উত্তরের পথ ধরলেন। ফলে সকলের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, যুদ্ধ হবে রোমানদের সঙ্গে। কিছুদূর যাওয়ার পর গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। এবার তিনি রওয়ানা হলেন দক্ষিণ পূর্ব দিকে। অর্থাৎ গোটা পথ তিনি অতিক্রম করলেন আকা বাঁকা পথে ফলে তার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে কেউ কিছু আঁচ করতে পারল না। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসলিম বাহিনী মক্কার শেষ প্রান্তে পর্বতমালার কাছে ছাউনি ফেলার পূর্বে সে আমলের বিবেচনায় দশ হাজার সৈন্য বাহিনীটি ছিল বেশ বড়। এত বড় বাহিনীকে সহজে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা সম্ভব ছিল না। অথচ মক্কাবাসীরা মুসলিম বাহিনীদের আক্রমণের কথা জানতে পারে হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে[7]।

সামরিক অভিযানের সময় সৈন্য বাহিনীতে সম্মিলিতভাবে পাক করার রীতি আছে। এবার সে রীতি পরিহার করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে তাদের রান্নার ব্যবস্থা করতে বললেন। ফলে দশ হাজার প্রজ্বলিত চুল্লী দূর থেকে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। মক্কার শাসক আবু সুফিয়ান একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে বাস্তব অবস্থা জরীপ করে এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মক্কা আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সে পাহাড়ের চুড়া থেকে নেমে আসে। ঠিক সে সময় মুসলিম বাহিনীর

---

[7] অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী,কুরআন হাদীসের আলোকে সৈনিকের কর্তব্য, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: ই, ফা,বা,১৯৮৭।

একটা পেট্রোল দল সেখানে পৌঁছে এবং আবু সুফিয়ান তাদের হাতে ধরা পড়ে।

সে ছিল মক্কার সামরিক প্রধান। অথচ তার গ্রেফতার সম্পর্কে মক্কাবাসীরা কিছুই জানতে পারল না। তাকে নবীজির সামনে হাজির করা হলে তিনি তার নিরাপদ অবস্থান এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। পরের দিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর প্রধান হিসেবে মক্কানগরীতে প্রবেশ করেন। অথচ মক্কার লোকেরা মুসলিম বাহিনীর গতি-বিধি সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গও জানত না। এমনকি তাদের নেতাও ছিল শহরের বাইরে মুসলিমদের হাতে। নবীজীর নির্দেশে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু সুফিয়ানকে এমন একটি জায়গায় দাঁড় করালেন যেখান থেকে তিনি মুসলিম বাহিনীকে অনায়াসে দেখতে পায়। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। সৈন্যবাহিনী এক একটি দলের নেতৃত্ব দিলেন এক একজন গোত্র প্রধান। আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে কোন একদল অতিক্রম-কালে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দলের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। সবশেষে আসলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজীর প্রতি ইঙ্গিত করে সুফিয়ানকে বলল- তোমার ভাইয়ের স্থান প্রকৃতপক্ষেই রাজা-ধিরাজে পৌঁছে গেছে। তার শক্তি ও প্রভাব এত বেশী যে, এখন রোম সম্রাটও তার ব্যাপারে ভীষণ আতংকিত। যাহোক আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তিনি তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু সুফিয়ানও নবীজীর সদিচ্ছার প্রতি অনুকূল সাড়া দিলেন। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রখর সমর কৌশল দিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন।

তাবুক অভিযান:

তাবুক যুদ্ধের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন হিরাক্লিয়াস মুসলিম রাষ্ট্র মদীনাকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে মদীনা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন। মুসলিম বাহিনীর এ বিরাট আয়োজন দেখে রোমানরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক প্রান্তরে ২০ দিন অবস্থান করেন.[8]। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। অনেকেই মুসলিম হলেন এবং دومة الجندل নামক খ্রিষ্টান শাসক কর প্রদান করতে সম্মত হয়। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে আসেন।

গোয়েন্দা সংবাদ প্রাপ্তি ও খলীফা নিযুক্ত:

মদীনা হতে বিতাড়িত ইহুদী সম্প্রদায় বনু নযীর ও বনু কোরায়জা গাফতান গোত্রসহ ৪০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী গঠন করে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেয়ে سباع بن

---

[8] এ,এফ,এম আব্দুল মজিদ,রাসূলুল্লাহর (সা)এর সৈনিক জীবন,১ম প্রকাশ, ঢাকা: ই, ফা,বা,১৯৪৬।

عرفطة কে মদীনার খলীফা মনোনীত করেন। ২০০ অশ্বারোহীসহ ১৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খায়বরের দিকে যাত্রা করেন।

পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব প্রদান:

খায়বরে তাদের মোট ৮ টি দুর্গ ছিল। মুসলিমরা তাদের ১৫ দিন অবরোধ করে রেখেছেন। ৮ টি দুর্গের মধ্যে قموص দুর্গটি ছিল সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। সে দুর্গটি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর হাতে বিজয় হয়েছে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তকে أسد الله الغالب বলে উপাধি দিয়েছেন কামীস দুর্গটি ঘেরাও করার পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথাব্যথা আরম্ভ হয়। যার কারণে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে এ গোত্রের দায়িত্ব দেন। তিনি জয় করতে পারেন নি। পরের দিন ওমরকে দিলেন। তিনিও ব্যর্থ হলেন তৃতীয় দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه সকালে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে ডেকে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন।

আপসে ইসলাম কবুলের আহবান:

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

«ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

ইহুদীরা ইসলাম কবুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তিনি প্রচণ্ড হামলা চালালেন। শত্রু বাহিনীর আক্রমণে তরবারি হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় একটি দরজাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মূতা অভিযান:

মূতা অভিযান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর জীবন পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম সুসংবাদ দিয়ে شرحبيل بن عمر الغساني এর নিকট হারেছ ইবনে উমায়েরকে পাঠান। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথিত হলেন এবং ৩০০০ হাজার মুসলিম সৈন্য সেখানে প্রেরণ করেন। পরপর সেনাপতি হিসেবে তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা দেন এবং নিম্ন লিখিত নিয়ম অনুসরণের নির্দেশ দেন। যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন বিজ্ঞ সমরবিদের দ্বারাই সম্ভব।

ক. যারা ইবাদত খানায় মগ্ন থাকবে তাদের হত্যা করা যাবে না।

খ. কোন স্ত্রী লোককে হত্যা করা যাবে না।

গ. কোন শিশু/ বৃদ্ধ লোককে হত্যা করা যাবে না।

ঘ. সবুজ ও শস্য ক্ষেত্র ধ্বংস করা যাবে না।

এ যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্বাচিত পর পর তিনজন সেনাপতিই শাহাদাতবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত খালিদ ওয়ালিদ এর হাতে ঝাণ্ডা আসে। সে দিন তার হাতে ৯ টি তরবারী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এ যুদ্ধের পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদকে سيف الله–উপাধি তে ভূষিত করেন।

হুনাইনের যুদ্ধ:

এ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হুনাইন বসবাসরত -هوازم ثقيف গোত্রদ্বয় মক্কা বিজয়ের ফলে আশংকাবোধ করল যে হয়ত: মুসলিমগন তাদের উপর হামলা চালাবে। তাই তারা চার হাজার যোদ্ধা গঠিত করল। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২০০০ বার হাজার সৈন্য নিয়ে হুনায়নে যান। কিন্তু তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে মুসলিম সেনারা যখন পালাতে শুরু করল, তখন যুদ্ধের ময়দানে সাহসের সাথে যুদ্ধ করে চলেছিলেন সাহসী সমরবিদ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি পলায়নরত সৈন্য বাহিনীকে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আহবান জানালেন এই বলে–

يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الأنصار

তখন সব মুসলিমগন জড়ো হয়ে পুনর্বার হামলা চালায়। অবশেষে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। প্রথমে কাফিররা পাহাড় ও জঙ্গলে থেকে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুসলিম সেনাদের পালাতে বাধ্য করে। এ যুদ্ধে ৭,০০০ হাজার লোক মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। ২৪,০০০ হাজার উট, ৪০,০০০ হাজার এর অধিক ভেড়া ও বকরী ৪,০০০ হাজার স্বর্ণ রৌপ্য গনিমত হিসেবে লাভ হয়।

উপসংহার:

উপরের প্রতিটি যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপই সামরিক দৃষ্টিকোণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা একজন সামরিক প্রধানই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। সুতরাং উপরোক্ত সামরিক নীতিসমূহ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে না; বরং ঐ সকল পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সামরিক প্রধানকে উৎসাহিত করেও বটে। যা কিনা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমরবিদ হওয়ার যথার্থ প্রমাণ রাখে। তাই আমরা এ কথাই বলব যে, গভীর মনে উপরোক্ত কৌশলগুলোকে গবেষণা করলে সফল সমরবিদ হওয়ার আরও নতুন নতুন পন্থা বেরিয়ে আসবে।